‘পথের পাঁচালী’-র প্রাসঙ্গিকতা

সোমেশ্বর ভৌমিক

‘নচিকেতা ওয়াজ এ ফুল’--তবু তারই উক্তি, ‘সবকিছু জ্বলছে, ব্রহ্মাণ্ড পুড়ছে!’
আসলে সংবেদনশীল শিল্পী তাঁর উপলব্ধির দর্পণে অগ্নিগর্ভ এক যুগের অতিস্বচ্ছ প্রতিফলনকে প্রকাশ করার লোভ সংবরণ করতে পারেন না আর। হয়তো নিজের রচনার বিষয়গত অস্বচ্ছতা, কৃত্রিমতা এরং দুর্বলতাই তাঁকে এই পথঅবলম্বনে বাধ্য করে। নিজের অনুভূতিকে শিল্পের ভাষায় সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে না পেরে, কিছুটা মরিয়া হয়েই যেন,সারসংকলক এই বাক্যটিকে শেষ পর্যন্ত তিনি বসিয়ে দেন ‘নির্বোধ’ চরিত্রটি উচচারণে। শিল্পের দাবী ক্ষুন্ন করেই তাঁকে পালন করতে হয় তাঁর জীবনবোধের দায়, যুগসচেতন মানসকিতার দায়িত্ব। ঋত্বিকের ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’-ই অবশ্য একমাত্র উদাহরণ নয়। ভারতে প্রাপ্তমনস্ক, জীবনবোধে সমৃদ্ধ চলচিচত্ররচনার ধারাটি, দু-একটি বিরল ব্যতিত্রম বাদে, সাধারণভাবেই প্রক্ষিপ্ত সংযোজনের এই ট্রাজেডিতে আচছন্ন।

অথচ এই ধারার সফল সূত্রপাত যেখানে, সেই ‘পথের পাঁচালী’ ছবিটি কিন্তু তার নিচচার শিল্পনির্মিতির বৈশিষ্ট্যের দ্বারাস্রষ্টার জীবনবোধকে পতিপন্ন করেছিল অনায়াসে। শিল্পের মহিমা আর কখনও এমন ভাস্বর হয়ে ওঠে নি ভারতীয় সিনেমার পর্দায়, জীবনের জটিল প্রবাহ এমনভাবে অধিকার করে নি সেলুলয়েডের দৈর্ঘ। আজ, পঞ্চাশ বছর পরেও, সেই তাৎপর্যেই মহীয়ান হয়ে ওঠে এ-ছবি। হঠাৎ - আলোর - ঝলকানি হিসেবে এর খ্যাতি, ঋিচলচিচত্রের দরবারে ভারতীয় সিনেমার আসন স্থায়ী করতে এর আগমন--নিছক আলঙ্কারিক গুত্বেই সীমাবদ্ধ থাকে এসব ঐতিহাসিক তথ্যের আবেদন।

একথা সত্যি অন্তত আমাদের কাছে, আমরা--যারা ছবি দেখছি মাত্র অল্প ক-বছর ধরে। ‘পথের পাঁচালী’-র যুগের মানুষ নই আমরা। এ-ছবির প্রথম আবির্ভাবের সেই যুগ আর আমাদের মধ্যে প্রায় সার্ধ দশকের ব্যবধান। এই অন্তর্বতী সময়ে ভারতীয় ছবির জগতে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষাই হয়ে গেছে, অল্পবিস্তর সাফল্যের সঙ্গে। ভারতীয় সিনেমার নিরবচিছন্ন শিল্পহীনতা নিয়ে আমাদেরর জায়মান চলচিচত্রচৈতন্যে জাগেনি কোন হীনমন্যতা--যার শিকার আমাদের অধিকাংশ পুর্বসূরী। দেশজ চলচিচত্রে আজ আমরা যথেষ্ট আস্থাবান।

আবার, শিল্প-সংস্কৃতির জগতে আমরা এসেছিলাম একটা অস্থির সময়ে। প্রচলিত রাজনৈতিক ধ্যানধারণার সমালোচনা আর পুনর্মূল্যায়নের সময় তখন। পুনর্মূল্যায়ন চলছিল শিল্পের জগৎকে ঘিরেও। বিশেষ করে অবক্ষয়ী প্রতিত্রিয়াশীল সংংস্কৃতির বিপক্ষে প্রগতি - সংস্কৃতির ভূমিকা এবং কার্যকলাপ নিয়ে শু হয়েছিল বিতর্ক। সেই আলোচনায় সমাজের প্রতি শিল্পীর দায়িত্বের বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়েছিল।

অথচ ঠিক সেই সময়েই একটা প্রবল সামাজিক আলোড়নের অসম্পূর্ণ, যান্ত্রিক প্রতিফলন দেখা গেছে সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে। একে একে তাঁর কাছ থেকে আমরা পাচ্ছি আমাদের সমসায়য়িক ‘প্রতিদ্বন্দ্বী ’, ‘সীমাবদ্ধ’ অথবা ‘অশনি সংকেত’। মনে হয়েছে, প্রখর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, সমাহিত শিল্পরীতির প্রতি অসীম পক্ষপাত, অধিগত বুর্জোয়া মানসিকতার সঙ্গে সহজাত সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি এক জটিল বিন্যাস যুগের অন্তর্বস্তু উপলব্ধির পথে তাঁর অন্তরায়। সমালোচনার চরমে পৌছে এমনি অবক্ষয়ের পথিক বলেও তাঁকে চিহিত করেছেন কোন কোন মহল। বিরূপতার এই প্রতিকূল পরিবেশেই আমরা পেয়েছি শিল্পীর বহু - আগে - ফেলে- আসা দিনের স্পর্শ-- ‘পথের পাঁচালী’ ছবি আমাদের চৈতন্য উঠেছে আলোড়ন--এ ছবির প্রতিটি ফ্রেমে বিশ্লেষণের তীক্ষ্নতায়, এর সার্বিক ঐর্যের দ্যুতিতে।
সরল, নিস্তরঙ্গ গ্রামজীবনের নিরাভরণ, বাস্তবমুখী আলেখ্য --এই হলো ‘পথের পাঁচালী’ বিষয়ে প্রচলিত খ্যাতি। জানি না, গ্রামের জীবনের ছবি বলেই শহুরে বুদ্ধিজীবী মানসিকতায় তার সম্পর্কে সরলতার ধারণাটি অনিবার্য হয়ে উঠেছে কিনা। সন্দেহটা কিন্তু থেকেই যায়। সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ার পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের যে বিকৃত, সুবিধাবাদী সহাবস্থান এদেশের অর্থনীতিক কাঠামো পঙ্গু করে দিয়েছিল, উপরিসৌধেও যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল তার। ফলস্বপ, এদেশে বুদ্ধিজীবী মানসিকতার বুর্জোয়া ধ্যানধারণার প্রলেপটি যথেষ্ট

পুষ্ট হলেও, সামন্ত মূল্যবোধের কোন অবশেষই সেখানে পাওয়া যাবে না, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় কি ? বিশেষত আধুনিক বুদ্ধিজীবী শ্রেনীটি ত প্রায় ব্যতিত্রমহীনভাবেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর রূপান্তর সামন্তপ্রভুসুলভ পিছুটান (nostalgia) আচ্ছন্ন শ্রেণীটির কাছে গ্রাম মানেই 'সুখের নীড়'। 'পথের পাঁচালী'-কে নিয়ে মুগ্ধকাব্য প্রচুর হলেও এ-ছবির আসল মূল্য যে আজও নিরূপিত হয় নি, তার প্রধান কারণ বোধহয় বুদ্ধিজীবীর এই আত্মগত (subjective) ধারণা, যা যুক্তিনির্ভর, বস্তুনিষ্ঠ (objective) বিশ্লেষণের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে।

কার্ল মার্ক্স্ ঐতিহ্যাশ্রয়ী ভারতীয় গ্রাম সমাজকে গতিহীন অচলায়তন বলেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি এ-ও বলেছিলেন যে, অষ্টাদশ শতকে পুঁজিবাদ- সাম্রাজ্যবাদের সংস্পর্শে এসে সে-সমাজে ভাঙন দেখা দিয়েছিল, তাতে এসেছিল অভূতপূর্ব গতি। ফলে অর্থনীতিক বৃত্তি এবং বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার যে সমীকরণ ছিল সে গ্রামসমাজের বৈশিষ্ট্য, তাতেও অল্পবিস্তর পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। অন্তত বৃটিশ - প্রবর্তিত আধুনিক অর্থনীতিক ব্যবস্থার চাপে এই অবক্ষয়ী সামাজিক প্রথার যে নাভিশ্বাস উঠেছিল, কোন সন্দেহ নেই তাতে। 'পথের পাঁচ ালী' ছবির জগৎ ত সেই সংঘাতজনিত অবক্ষয়েরই এক খণ্ডাংশের সার্থক প্রতিচ্ছবি।

'পথের পাঁচালী' দেখতে গিয়ে অপুর চরিত্রকে নিশ্চয়ই গুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে, কিন্তু সেটিকেই কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে ধরে নিলে এ-ছবির আসল বক্তব্য থেকে আমরা অনেক দূরে সরে আসবো মনে হয়। কোন কেন্দ্রাভিগ প্রবণতার সন্ধান এখানে না করাই ভালো। কোন একটিমাত্র চরিত্রকে কেন্দ্রে রেখে 'পথের পাঁচালী' গড়ে ওঠেনি, যেমন গড়ে উঠেছে 'অপরাজিত' বা 'অপুর সংসার'। এ-ছবির কেন্দ্রে আছে সমগ্র রায়-পরিবার। পরিবারের প্রত্যেকেইএখানে সমান গুত্বপূর্ণ--ইন্দিরঠাকরণ, হরিহর, সর্বজয়া, দুর্গা এবং অপু। ত াদের পারস্পরিক সম্পর্ক, আদানপ্রদান ত বটেই, তাছাড়া বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সম্পর্ক, আদানপ্রদান---এসবের এক জটিল বিন্যাস নিয়েই এ-ছবির সংগঠন। তাই ত অনেক ধৈর্য ধরে, অনেক সময় নিয়ে পাঁচটি মূল চরিত্রকে বিকশিত করেছেন পরিচ ালক। এ-ছবিতেই প্রসন্ন গুমশায়ের বেলায় যেমন করেছিলেন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠার (typeset establishment) সেই সংক্ষিপ্ত পথটি সযত্নে পরিহার করেছেন এদের ক্ষেত্রে।

চরিত্র-বিকাশের মধ্যে দিয়ে জটিল এক সমাজ - প্রক্রিয়াকে ফুটিয়ে তোলার চিন্তার আচ্ছন্ন সত্যজিৎ অসংখ্য ডিটেলের (detail) সাহ ায্য নিয়েছেন ছবিতে। গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন জীবন থেকে আহরণ করা এইসব ডিটেলের দৃশ্যগত তুচ্ছতাও হয়তো সরলতার বিভ্রম তৈরিতে ইন্ধন জুগিয়েছে। কিন্তু প্রয়োগ - কৌশলের নৈপুণ্যে তাদের বিষয়গত ঐর্য বা ভাবসমৃদ্ধির যাথার্থ্য যদি উপলব্ধি করি, ত ারপরেও সরলতার ধারণাটি পোষণ করা বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে না কি? ডিটেলের অফুরন্ত সমারোহ এখানে! তাদের কোনটি ফুটিয়ে তোলে ব্যক্তিগত অনুভূতি, কোনটি হয়ে ওঠে শ্রেণী-বৈশিষ্টের দ্যোতক, আবার কোনটি ব্যাখ্যা করে ঘটনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য। আব ার একাধিক ব্যঞ্জনার সংশিশ্রণও কোন কোনটা। সব মিলিয়ে আশর্চ্য জীবন্ত হয়ে ওঠে প্রতিটি চরিত্র, জীবন্ত হয়ে ওঠে সমাজ, ইতিহাস।

ডিটেলের এই প্রয়োগকে অন্যভাবেও দেখেছেন কেউ কেউ। কিন্তু তাঁদের অনুসরণে ডিটেলের ব্যবহারকে এক্ষেত্রে ব্যবহারিক (behaviouristic), প্রাকৃতিক (atmospheric),বিন্যাসগত (textural) ইত্যাদি আলঙ্কারিক বাপ্রকরণগত অভিধায় চিহ্নিত করলে, সেগুলির ব্যঞ্জনাকেই সীমাবদ্ধ করা হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ধরা যাক, রেল কথা। অপু-ত্রয়ীতে অনেকবার এসেছে এই রেলের কথা। তবে 'অপরাজিত' বা 'অপুর সংসার' ছবি দুটিতে রেলের ব্যবহার একটু ব্যাপক অর্থে, বিষয়গত প্রধান উপাদন (leit motif) হিসেবে। 'পথের পাঁচালী'-তে যে দুবার এর ব্যবহার হয়েছে, সেখানে ডিটেল হিসেবেই এর প্রয়োগ। প্রথমবার, সন্ধেবেলার ঘরে বসে অপুর রেলের বাঁশি শোনায়, আর একবার দিদির সঙ্গে অনেক দূরের পথ পেরিয়ে কাশবনের ধারে রেলগাড়ি দেখায়। কী বলবো এই ডিটেলকে ? প্রাকৃতিক না বিন্যাসগত ? বরং এর মধ্যে গভীরতর কোন দ্যোতনার সন্ধান পাওয়া যায় কিনা দেখা যাক। তাঁর 'ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ' (The Future Results of British Rule in India) প্রবন্ধে মার্ক্স্ লিখেছেন, "The railway system will… become in India truly the forerunner of modern industry…Modern industry, resulting from the railway system, will dissolve the hereditary divisions of labour, upon which rest the Indian castes, those decisive impediments to Indian power."

অবশ্যই সত্যজিৎ রায় মার্ক্স্ -এর বিশ্লেষণ অনুসারে আধুনিক শিল্প - অর্থনীতির সঙ্গে পুরনো গ্রামীণ অর্থনীতির প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের অবত ারণা করেন নি ছবির কোথাও। কিন্তু মূল উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহকে অনেকখানি বদলে নিয়ে অপু-দুর্গার রেলগাড়ি দেখে ফিরে আসার

পথে মৃত ইন্দিরঠাকণকে আবিষ্কার করার ঘটনাটি সাজান তিনি। আধুনিক যুগের সঙ্গে অপুর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পরমুহূর্তেই কেন এভাবে ছিন্ন হলো প্রাচীন যুগের সঙ্গে তার যোগসূত্র? অথচ রেলগাড়ির সঙ্গে অপুর মানসিক দুরত্ব অক্ষুণ্ণই থাকল--দৃশ্যসুখের আবেশ তা সাময়িক।

ব্যঞ্জনা মনে হয় এখানে আরও ব্যাপক। পুঁজিবাদী অর্থনীতি আর সামন্ত অর্থনীতির সংঘাতের যে কুফল সেটাই হয়তো এখানে প্রধান বক্তব্য। আর তারই সঙ্গে বোধহয় জড়িয়ে আছে এক অনিবার্য বিষাদ - এই সংঘাতে প্রাচীনের বিনাশ হলো সত্যি, কিন্তু নতুন ব্যবস্থার স্বাভাবিক উন্মেষ তথা বিকাশের সুফল পেল না ভারতের গ্রামসমাজ।

এই সিদ্ধি বা সিদ্ধান্ত যে কোন বিশেষ মতাদর্শে অনুপ্রাণিত সত্যজিতের সতেচন অভিপ্রায় অনুসারী, এমন দাবী করাঅসঙ্গত। কিন্তু শিল্পে সংগঠনে শিল্পীর পরিকল্পনা বহির্ভূত কোন গভীরতর ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠার ঘটনা দুর্লভ হলেও অবাস্তব কিছু নয়। বরং তা শিল্পের মহত্ত্বেরই প্রকাশ।

'পথের পাঁচালি'-তে রেল প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্য করার বিষয়, এর আগে পর্যন্ত ছবিতে একটা আনন্দ - উত্তেজনার সুর ; কিন্তু এর পর থেকেই ছবির মেজাজ ক্রমশ বিষণ্ণ ভারাক্রান্ত হয়ে আসে। ছবির মূল দুর্ঘটনাগুলো পরপর ঘটতেথাকে--ইন্দীরঠাকণের মৃত্যু, হরিহরের নিদ্দেশযাত্রা, দুর্গার মৃত্যু এবং রায় পরিবারের নিশ্চিন্দপুর ত্যাগ। অর্থাৎরেলের প্রসঙ্গটি নিঃসন্দেহে ছবিতে একটি পর্বান্তর সূচিত করে। রায় - পরিবারের জীবনযাত্রার খুব ঘনিষ্ঠসান্নিধ্যে না এসেও রেলগাড়ি যে নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়ে গেল, সংকট - ভাঙনকে যেভাবে ত্বরান্বিত করলো, তাতে আদ্যাপান্ত এই ঘটনায় ঐতিহাসিক মাত্রা আবিষ্কারের চেষ্টা অপচেষ্টা হবে না নিশ্চয়ই ! আর সেইজন্যেই, মার্ক্স্ যেমন বলেছিলেন, বৃটিশ - প্রবর্তিত শিল্প - অর্থনীতিব্যবস্থা, বিশেষ করে রেলওয়ে, হলো ইতিহাসের নিমিত্তমাত্র (unconscious tool of history), 'পথের পাঁচালী'-র রেলগাড়ীর প্রসঙ্গটিকে সেই আলোয় পুনর্মূল্যায়ন করা যায় বোধহয় ।

এমনকি এই তাৎপর্য স্বীকারের সূত্রেই 'পথের পাঁচালী'-র যথার্থ রসাস্বাদনের কেন্দ্রটিও পেয়ে যেতে পারি আমরা। জন্ম - মৃত্যুর তরঙ্গাভিঘাতসহ চিরন্তন গ্রামীণ জীবনপ্রবাহের কাব্য--এ - ছবি সম্পর্কে এই যে প্রচলিত ব্যাখ্যা, তাতেএক বিশেষ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত যোগ করে সমাজ ইতিহাসের এক অমোঘ প্রক্রিয়াকে এ-ছবি থেকে খুঁজে নিতে পারি।

বৃটিশ - প্রবর্তিত নতুন অর্থনীতিক পরিবেশে অর্থনীতিক বৃত্তিনির্ভর বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার অনুপযোগিতায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল গ্রামীণ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। হরিহর আর তার পরিবার সেই সম্প্রদায়েরই প্রতিভূ। আবার অর্থসর্বস্ব পরিবেশে অর্থ বিষয়ে হরিহরের উদাসীনতা, অর্থ - বিদ্যা বিনিময় প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত হতে তার প্রাথমিক আপত্তি পুরনো যুগের বুদ্ধিজীবী মানসিকতারই লক্ষণ। হরিহরের অস্তিত্বের সংকট এক বৃহত্তর সমস্যার দ্যোতক হিসেবেই উপস্থিত। এবং দক্ষ রূপায়ণের মাধ্যমে 'পথের পাঁচালী' ছবিতে তা সার্থকও হয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গত 'পথের পাঁচালী'-র এক দেশজ অখ্যাতির বিষয়টিও বিচার করে নেওয়া যেতে পারে। এ-ছবির কাব্যমাধুর্য এর সমাজবাস্তবতাকে লঘু, এমনকি বিকৃত, করে দিয়েছে--এই হলো সমালোচনা। যুক্তি হিসেবে বলা হয়, দ্বন্দ্বসঙ্কুলগ্রামজীবনের গুত্বপূর্ণ বহু অনুষঙ্গকেই আড়ালে রেখেছে বা উপেক্ষা করেছে এ-ছবি, যেমন ধনী জমিদার বা গরীবকৃষক। আক্ষরিক অর্থের কথাগুলো সত্যি কিন্তু এর জন্যেই 'পথের পাঁচালীর-র সমাজ বাস্তবতায় ঘাটতি পড়েছে, এমন সিদ্ধান্ত বোধহয় যান্ত্রিক।'

শিল্পে জীবনই কথা বলে। কিন্তু জীবনের সব খুঁটিনাটি, সমস্ত আনাচ-কানাচ একটিমাত্র শিল্পকর্মেই ধরা পড়বে, এমন আশা বাতুলতা। কোন সমাজ - পরিবেশের সামগ্রিক ছবিকে তুলে না ধরলেই শিল্পকর্ম ব্যর্থ বা বিকৃত হয়ে যায় না বোধহয়। আলোচ্য শিল্পকর্মের নির্দিষ্ট পরিধিতেই প্রথমে যাচাই করে দেখা দরকার, কোন সমস্যার সুষ্ঠু রূপায়ণে সেটি সার্থক হয়েছে কিনা। এবিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকলে একমাত্র তখনই সেই শিল্পকর্মে নির্দিষ্ট পরিধিটিরযাথার্থ্য বিষয়ে প্রশ্ন তোলা যায়।?

'পঁথের পাঁচালী'-র ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রশ্নে আমরা আসতে পারি কি ? 'গ্রামজীবনের নিপুণ আলেখ্য' বলে এ-ছবির যে খ্যাতি, আলোচ্য অখ্যাতি, বোঝাই যায়, তারই এক যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া। কিছুটা যে খ্যাতি , আলোচ্য অখ্যাতি, বোঝাই যায়, তারই এক যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া । কিছুটা অভিমানও বোধহয় মিশে আছে এই প্রতিক্রিয়ায় - কারণ গ্রামের বাস্তব সমস্যাকে সম্যক্ না বুঝে তাকে নিয়ে কাব্য করবার

শহুরে মানসিকতা, গ্রামীণ জীবন বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকের চোখে অবজ্ঞাপ্রসূত রোম্যান্টিক অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং স্বভাবতই এটা তাঁদের আহত করে। কিন্তু 'পথের পাঁচালী'-কে যদি দেখি আধুনিক অর্থনীতি পরিবেশে গ্রামীণ মধ্যবিত্তের সংকটের ছবি হিসেবে, তাহলে ধনী জমিদার বা দরিদ্র কৃষকের অনুষঙ্গ এই বিন্যাসে অপরিহার্য মনে হয় না। বরং কিছুটা রোমান্টিক চেতনা নিয়েই সত্যজিৎ যে সংকটের গভীরে পৌঁছতে পেরেছেন, রূঢ় বাস্তবের আলোয় তাকে যাচাই করেছেন, এর জন্যে প্রশংসাই প্রাপ্য তাঁর।

সাধারণ অর্থে, 'পথের পাঁচালী' ছবির উপজীব্য গ্রামীণ জীবযাত্রার গণ্ডী খুবই সীমায়িত -- হরিহরের ভিটের বাইরে তা পা বাড়ায় না কখনও। তবে সেই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেও জীবনের বৈচিত্র, ব্যাপকতা, গভীরতা, তুচ্ছতা -- সব-কিছুই আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে এ-ছবি।

ইন্দির 'গ্রামবাংলার আত্মা', হরিহর গ্রাম্য 'অচলায়তন', ভাগ্যবাদিতার প্রতীক, সর্বজয়া গ্রাম্য সংকীর্ণতা, তুচ্ছতার আর অপু-দুর্গা প্রতীক গ্রাম সারল্যের --এই সব বর্ণনার অধিকাংশেই আলঙ্কারিক উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য। এই রূপকার্থে এদের না দেখাই ভালো। নিজস্ব শ্রেণীগণ্ডীর মধ্যেই তারা জীবন্ত, সার্থক এবং প্রতিনিধিস্থানীয়।

"Ray came along to recharge the batteries of humanist cinema at a time when neo-realism had sacrificed its momentum," লিখেছিলেন বৃটিশ সমালোচক পেনিলোপ হাউস্টন। 'পথের পাঁচালী' ছবির আলোচনায় ইতালীয় নয়াবাস্তবতার প্রসঙ্গ এসে পড়ে প্রায় অনিবার্যভাবেই। অথচ ১৯৫৭ সালে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে সত্যজিৎ মন্তব্য করেছিলেন, " 'পথের পাঁচালী'-র চলচ্চিত্র আঙ্গিকের সঠিক ভিত্তি নয়া- বাস্তবতাবাদী বা অন্য কোন ধরনের চলচ্চিত্র নয়, এমনকি এই আঙ্গিক অন্য কোন চলচ্চিত্রকর্ম থেকেও উদ্ভুদ্ধ নয়, বরং এই আঙ্গিক বিভূতিভূষণের এই উপন্যাস থেকেই উদ্বুদ্ধ"। সেই প্রাথমিক উচ্ছ্বাসপর্বে, দেশেবিদেশে 'পথেরপাঁচালী'-র সংগঠন আর ইতালীয় নয়াবাস্তবতাবাদী চলচ্চিত্রের সংঘটনে কিছু আপাত-সাদৃশ্য লক্ষ্য করে 'পথের পাঁচালী'-কে নয়াবাস্তবতার সফল উত্তরসূরী হিসেবে প্রচার করা হচ্ছিল যখন, মন্তব্যটি তারই প্রতিক্রিয়ায়। পিঠ-চাপড়ানোর ভঙ্গীতে প্রকাশিত এইসব মন্তব্যে শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা কতটা ছিল জানি না, কিন্তু তাঁর স্বকীয়তার অবদানকেঅনেকখানি খাটো করে দিয়েছিলেন এইসব সমালোচক। সত্যজিতের মন্তব্যেও সঠিক স্বীকৃতির অভাবে একটা ক্ষোভের প্রচ্ছন্ন সুর ধরা পড়ে।

তবে বিভূতিভূষণের মূলভাব এবং তার প্রাথমিক অনুপ্রেরণা শেষ পর্যন্ত তাঁর কতটা সহায় হয়েছিল, এব্যাপারে সন্দেহ থেকে যায়। হয়তো লক্ষ্য করেন নি সত্যজিৎ, চিত্রনাট্য রচনার সময়ে অনিবার্য পরিবর্জন, পরিমার্জন, পুনর্বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে তিনি অতিক্রম করে গেছেন বিভূতিভূষণের গণ্ডী, ঔপন্যাসিকের বিশুদ্ধ গ্রামীণ (idyllic) মেজাজের নমনীয়তা। 'পথের পাঁচালী' ছবির সত্যজিৎ অনেক ঋজু, প্রায় সমাজবিজ্ঞানী এক শিল্পী।

'পথের পাঁচালী'-র মেজাজের অনেক ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলেন বরং বৃটিশ সমালোচক পরিচালক লিন্ড্সে অ্যান্ডার্সন। এ - ছবির সমালোচনায় রেনোয়া এবং ফ্ল্যাহার্টির প্রসঙ্গ এনে তিনি লিখলেন, "'To admire on rinciple,' Coleridge observed, 'is the only way to imitate without loss of originality.' Ray's admiration of Renoir is of this kind" ; আবার, "To make Pather Panchali Ray must have lived as closely with his characters as Flaherty had to live with his Polynesians, when he made Moana"। কিন্তু আসল কথাটা উপসংহারে বলেন অ্যাণ্ডার্সন, "It is to compliment Ray, not to deny his originality, that I mention names like Renoir and Flaherty. And another fertilizing influence has surely been the neo-realism of De Sica, Zavattini and Rosellim"।

নাট্যনির্মিতির ক্ষেত্রে এ-ছবি সনাতন বর্ণনাত্মক রীতিকেই আদ্যন্ত অনুসরণ করেছে। অথচ প্রচলিত অর্থে আরোহন - অবরোহনের ধারাটিও এখানে বিস্তভাবে অনুসরণ করা হয়নি। বরং নয়াবাস্তবতার রীতিতে ছোট ছোট আপাততুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনাকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে ছবি। তবুও সেই বহু নন্দিত ইতালীয় ধারার সঙ্গে 'পথের পাঁচালী'-র মৌলিক পার্থক্য চোখে পড়ার মতো। নয়াবাস্তবতার প্রধান আশ্রয় ছিল তাৎক্ষণিক সমাজসংকটের রূপায়ণ। সেই সংকটে আপন্ন দরিদ্রশ্রেণীর জন্যে উদ্বেগটাই সেখানে বড়ো হয়ে ফুটে উঠতো। সমস্যার কোন গভীর বিশ্লেষণে যাওয়ার চেষ্টা থাকত না আর। সময়ের ব্যাপ্তি হতো খুবই সংকীর্ণ। 'পথের পাঁচালী'-তে সময়ের ব্যাপ্তির যে আভাস সত্যজিৎ রাখলেন, নিঃসন্দেহে ধ্রুপদী রীতির চলচ্চিত্রই তার অনুপ্রেরণা। বহুমান জীবনের বিশিষ্ট এক যুগসন্ধিক্ষণে ব্যাপকএকটি সামাজিক শ্রেণীর সম্পূর্ণ রূপটি ফুটে উঠলো তাঁর হাতে।

অথচ গঠনরীতিতে ধ্রুপদী চলচ্চিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আত্মস্থ করেও এখন তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক হয়ে উঠেছে আরক'টা ছবি? পরিচালকের অসামান্য পর্যবেক্ষণশক্তি ছবিটিকে শুধু কাব্যমাধুর্যেই পূর্ণ করে নি, সামাজিক পরিবর্তনের এক মননশীল বিশ্লেষণ গড়ে তুলতেও তার অবদান অপরিসীম। আর এই বিশ্লেষণাত্মক মাত্রার জোরেই 'পথের পাঁচালী' ধ্রপদী চলচ্চিত্ররীতির চেয়েও অগ্রমামী--সামাজিক সচেতনতার ক্ষেত্রে।

নয়াবাস্তবতার সঙ্গে বৈসাদৃশ্য আরও আছে। ইতালীর সেইসব ছবিতে পারিপাট্যের অভাবই ছিল রীতি কতটা ফ্যাশন । সত্যজিৎ কিন্তু সে-পথে পা-ই বাড়ান নি। অনেক বাধা - বিপত্তি এবং অর্থাভাবের মধ্যে তোলা হলেও, 'পথের পাঁচালী'র অঙ্গসৌষ্ঠবে এতটুকু ত্রটি চোখে পড়বে না দর্শকের।

বলা যায়, সত্যজিৎ ধ্রুপদী রীতির থেকে নিয়েছেন তার সংগঠন - নৈপুণ্য, পারিপাট্য, আর নয়াবাস্তবতা থেকে তার সমাজসচেতন বাস্তবমুখিনতা। কিন্তু তার সঙ্গেই নিজস্ব এক বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গী যোগ করে তিনি গড়ে তুলেছিলেন'পথের পাঁচালী'-র সংঘঠন। সেই বিশ্লেষণে সোচ্চার আবেগের প্রাবল্য নেই, আছে সমাহিত, নিচ্চার প্রজ্ঞার পরিচয়। তাই তা দর্শকের মনের মধ্যে গিয়ে আঘাত করে, তার আবেগকে উজ্জীবিত করে অনায়াসে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ত বটেই, হয়তো বিশ্বচলচ্চিত্রের দিগন্তকেও প্রসারিত করেছিলেন সত্যজিৎ রায়, সেই ১৯৫৫ সালেই।

সূত্রনির্দেশ

১. মার্কস্ - এঙ্গেল্স্, 'দ্য ফার্স্ট্ ইণ্ডিয়ান ওয়ার অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স'; পৃঃ ৩৪।

২. মন্তব্যগুলি পাওয়া যাবে আনন্দম্ ফিল্ম সোসাইটি প্রকাশিত 'মন্তাজ' পত্রিকায়, 'সত্যজিৎ রায় বিশেষ সংখ্যা', জুলাই ১৯৬৬।